প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর রন্ডির টাইম মেশিন

সত্যজিৎ রায়

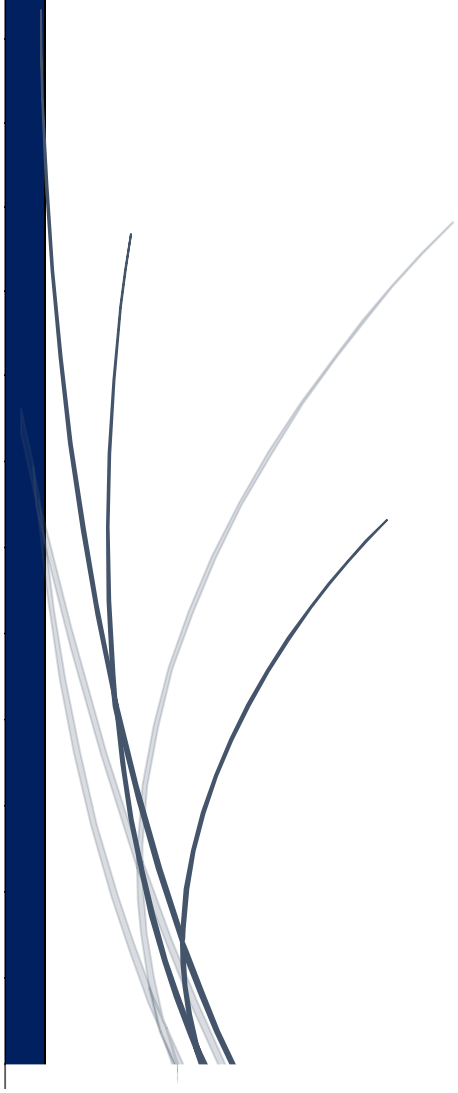

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

নভেম্বর ৭

পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অংশে তিনজন বৈজ্ঞানিক একই সময় একই যন্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে, এরকম সচরাচর ঘটে না। কিন্তু সম্প্রতি এটাই ঘটেছে। এই তিনজনের মধ্যে একজন অবিশ্যি আমি, আর যন্ত্রটা হল টাইম মেশিন। কলেজে থাকতে এইচ. জি. ওয়েলসের আশ্চর্য কাহিনী টাইম মেশিন পড়ার পর থেকেই আমার মনে ওইরকম একটা যন্ত্র তৈরি করার ইচ্ছা! পোষণ করে আসছি। শুধু ইচ্ছা নয়, গত বছর এ নিয়ে কাজও করেছি। কিছুটা। তবে সে কাজ থিওরির পর্যায়ে পড়ে। আমার ধারণা থিওরিটা বেশ মজবুত চেহারা নিয়েছিল, আর সে ধারণা যে ভুল নয়, সেটা প্রমাণ হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারিতে যখন ম্যাড্রিডে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে এই নিয়ে একটা প্রবন্ধ পড়ি। সকলেই সেটা খুব তারিফ করে। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং টাকার অভাবে কাজটা আর এগোয়নি। ইতিমধ্যে জার্মানির কোলোন শহরে প্রোফেসর ক্লাইবার টাইম মেশিন তৈরির ব্যাপারে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে খবর আমি পাই আমার জার্মান বন্ধু উইলহেলম ক্রোলের কাছ খেকে। ক্লাইবার ম্যাড্রিডে আমার বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন; সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। দুঃখের বিষয়, এই কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইবারের মৃত্যু হয় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। এটা হল পনেরো দিন আগের খবর। পদার্থবিজ্ঞানী ক্লাইবার ছিলেন ধনী ব্যক্তি, বিজ্ঞানের বাইরেও তাঁর নানারকম শখ ছিল। তার একটা হল দুপ্তপ্রাপ্য শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। খুনটা ডাকাতেই করেছে বলে অনুমান করা হয়, কারণ যে ঘরে খুন হয়-ক্লাইবারের কাজের ঘর বা স্টাডি–সে ঘর থেকে তিনটি মহামূল্য শিল্পদ্রব্য লোপ পেয়েছে। ক্লাইবারকে কোনও ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে হত্যা করা হয়েছিল। সে অস্ত্র পুলিশ বহু অনুসন্ধান করেও খুঁজে পায়নি, খুনিও আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি।

তৃতীয় যে বিজ্ঞানী এই একই মেশিন নিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি হলেন ইতালির মিলান শহরের পদার্থবিজ্ঞানী প্রোফেসর লুইজি রান্ডি। রন্ডির মেশিন তৈরি হয়ে গেছে,

এবং তার ডিমনস্ট্রেশনও হয়ে গেছে। রন্ডি ম্যাড্রিডে উপস্থিত ছিলেন না, এবং আমি আগে কিছুই জানতে পারিনি যে তিনিও একই গবেষণায় লিপ্ত। গত মাসে রন্ডির নিজের লেখা চিঠিতে জানি তার টাইম মেশিন তৈরি হয়ে গেছে। সে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিলানে গিয়ে তার যন্ত্র দেখে আসতে। আমি যে এই প্রতিযোগিতায় হেরে যাব এটা আমি আগেই আশঙ্কা করেছিলাম; তবে এই ফাঁকে যে রন্ডি কেল্লা ফতে করবে, সেটা অনুমান করতে পারিনি। আমি ভাবছি। এ মাসের মধ্যেই একবার মিলান ঘুরে আসব। রন্ডি শুধু যে আমার আতিথেয়তার ভার নিচ্ছে তা নয়; প্লেনে যাতায়াতের ভাড়াও সেই দেবে। আসলে রান্ডিও রীতিমতো ধনী। তার পরিচয় শুধু বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর রন্ডি হিসেবে নয়, সে হল কাউন্ট লুইজি রান্ডি। অতএব অনুমান করা যায়। সে বিশাল সম্পত্তির মালিক। অবিশ্যি আমি ব্যাপারটা বুঝি; এত বড় একটা আবিষ্কারের প্রকৃতি বিচার বিজ্ঞানীর দ্বারাই সম্ভব। বিশেষ করে আমি যখন ওই একই ব্যাপার নিয়ে কাজ করে এখনও সফল হতে পারিনি, তখন যন্ত্রটা আমাকে না দেখানো পর্যন্ত রন্ডির সোয়াস্তি হতে পারে না। এর জন্য দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করা একজন ধনী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কিছুই না।

যারা টাইম মেশিনের ব্যাপারটা জানে না, তাদের জন্য এই যন্ত্রের একটা বর্ণনা দেওয়া দরকার। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতীতে ও ভবিষ্যতে সফর করা সম্ভব। মিশরের পিরামিড কী ভাবে তৈরি হয়েছিল। তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখনও মতভেদ রয়েছে। টাইম মেশিনের সাহায্যে একজন মানুষ পাঁচ হাজার বছএ আগের মিশরে গিয়ে নিজের চোখে পিরামিড তৈরির ব্যাপারটা দেখে আসতে পারে। পাঁচ হাজার কেন, পঁচাত্তর লক্ষ বছর আগে গিয়ে দেখে আসতে পারে ডাইনোসর কেমন জীব ছিল। যাওয়া মানে সশরীরে যাওয়া কি না, সেটা রন্ডির যন্ত্র না দেখা অবধি বলতে পারব না। হয়তো এমন হতে পারে যে, দেহটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে, শুধু চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে উঠবে অতীতের দৃশ্য। তাই বা মন্দ কী? আজকের মানুষ যদি চোখের সামনে আদিম গুহাবাসী মানুষকে দেখতে পায়, অথবা আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের যুদ্ধ দেখতে পায়, বা আজ থেকে বিশ হাজার পরে পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে তা দেখতে পায়, তা হলে সে তো আশাতীত লাভ!

আমি স্থির করেছি রন্ডির আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। এই যন্ত্রের ব্যাপারে। আমি ছেলেমানুষের মতো কৌতূহল অনুভব করছি। এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

নভেম্বর ১২

আজ রন্ডির আরেকটা চিঠি। ইতিমধ্যে আর তার চিঠির জবাব দিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে সেটা পাবার আগেই আরেকবার লিখেছে। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের তারিফ পাবার জন্য মুখিয়ে আছেন। আমি আজই তাঁকে টেলিগ্রামে। জানিয়ে দিয়েছি আমার আসার তারিখ ও সময়।

এর মধ্যে আরেক গণ্ডগোল।

আজ সকালে হঠাৎ নকুড়বাবু এসে হাজিরা। এঁর কথা আমি আগে বলেছি। অতি অমায়িক, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, কিন্তু এঁরই মধ্যে মাঝে মাঝে একটা অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়, যার ফলে ইনি সাময়িকভাবে অনেক কিছুই বুঝতে এবং করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষে পারে না। তার মধ্যে একটা হল ভবিষ্যতের কোনও ঘটনা জানতে পারা-যেন ভদ্রলোক নিজেই একটি জীবন্ত টাইম মেশিন।

নকুড়বাবু যথারীতি আমায় প্রণাম করে আমার সামনের সোফায় বসে আমার কাজের ব্যাঘাত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাকে জানালেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আমায় একটা বড় বিপদের সামনে পড়তে হবে, এবং সেই ব্যাপারে তিনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন। আমি বললাম, বিপদ মানে? কী রকম বিপদ?

ভদ্রলোক এখনও হাত দুটো জোড় করে আছেন; সেইভাবেই বললেন, সঠিক তো বলতে পারব না। স্যার, তবে দেখলুম যেন আপনার ঘোর সংকট উপস্থিত–প্রায় প্রাণ নিয়ে টানাটানির ব্যাপার। তাই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে দিই।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কি?

তা তো জানি না। স্যার।

ব্যাপারটা ঘটবে কবে সেটা বলতে পারেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারি, নকুড়বাবু বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, ঘটনোটা ঘটবে একুশে নভেম্বর রাত নটায়। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না স্যার।

আমি মিলানে পৌঁছেব আঠারোই। অনুমান করা যায় যে মিলানে থাকাকালীন ঘটবে যা ঘটার। আমি যতদূর জানি, রন্ডি সদাশয় ব্যক্তি। তার সম্বন্ধে কোনও বদনাম শুনিনি কখনও। তা হলে কি বিপদটা আসবে রন্ডির যন্ত্র থেকে?

যা হোক, যা কপালে আছে তা হবে। তবে মরার আগে যদি একবার অতীত ও ভবিষ্যতে ঘুরে আসতে পারি তা হলে মন্দ কী?

নভেম্বর ১৮, মিলান

আমি আজই সকালে এখানে পৌঁছেছি। গমগমে, আধুনিক, ব্যস্ত শহর, ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। শহরের একটু বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি অঞ্চলে রন্ডির প্রাসাদোপম প্রাচীন বাসস্থান। রন্ডি নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এল। বয়স বাহান্ন হলেও মাজাঘষা ঝকঝকে চেহারার জন্য সেটা বোঝার উপায় নেই। মাথার চুল এখনও পাকেনি। ফ্রেঞ্চকটি দাড়ি আর গোঁফটাও কুচকুচে কালো।

এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে মুখ থেকে ক্লে পাইপ নামিয়ে রন্ডি বলল, তোমার বক্তৃতা আমি নিজে না শুনলেও, ইতালিয়ান পত্রিকা ইল টেম্পোতে ছাপা হবার পর সেটা আমি পড়ি। তুমি তোমার মেশিন তৈরি করতে পারোনি জেনে আমি দুঃখিত।

এর পর রন্ডি যা বলল, তাতে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

তোমাকে এখানে আসতে বলার পিছনে আসল কারণটা আমি চিঠিতে জানাইনি। সেটা এখন তোমাকে বলি। আমার যন্ত্র কাজ করছে ভালই; অতীত ও ভবিষ্যৎ দুদিকেই যাওয়া যায়, এবং ভৌগোলিক অবস্থান জানা থাকলে নির্দিষ্ট জায়গাতেও যাওয়া যায়। যেমন কালই আমি খ্রিস্টপূর্ব যুগে গ্রিসে দার্শনিকদের এক বিতর্কসভায় উপস্থিত হয়ে গ্রিক ভাষায় বাকবিতণ্ডা শুনলাম কিছুক্ষণ ধরে। সময়টা ছিল দুপুর। আমি যদি সকাল দশটা, বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌঁছোতে চাইতাম, তা হলে পারতাম না, কারণ আমার যন্ত্রে সেটা আগে থেকে স্থির করার কোনও উপায় আমি ভেবে পাইনি। এ ব্যাপারে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তুমি যদি এর একটা উপায় বাতলে দিতে পার, তা হলে তোমাকে আমি আমার কোম্পানির একজন অংশীদার করে নেব।

কোম্পানি? আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ। কোম্পানি, মৃদু হেসে বলল রন্ডি। টাইম ট্রাভেলস ইনকরপোরেটেড। যে পয়সা দেবে, সেই ঘুরে আসতে পারবে তার ইচ্ছামতো অতীতে বা ভবিষ্যতে। নিউ ইয়র্কের একটা কাগজে একটি মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তিন সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার এনকোয়ারি এসেছে। আমি অবিশ্যি জানুয়ারির আগে কোম্পানি চালু করছি না, কিন্তু এর মধ্যেই আচ পেয়ে গেছি এ ব্যবসায়ে মার নেই।

কত মূল্য দিলে তবে এই সফর সম্ভব হবে?

সেটা নির্ভর করে কতক্ষণের জন্য এবং কতদূর অতীতে বা ভবিষ্যতে সফর তার উপর। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের রেট বেশি। অতীতে ঐতিহাসিক যুগে দশ মিনিট ভ্রমণের রেট দশ হাজার ডলার। প্রাগৈতিহাসিক হলে রেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে, আর দশ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় হলে রেট প্রতি মিনিটে বাড়বে হাজার ডলার করে।

আর ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতে সফরের রেটে তারতম্য নেই। তুমি নিকট ভবিষ্যতে যেতে চাও বা সুদূর ভবিষ্যতে যেতে চাও, তোমার খরচ লাগবে পঁচিশ হাজার ডলার।

মনে মনে রন্ডির ব্যবসাবুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। এক হুজুগে আমেরিকান লাখাপতি-ক্রোড়পতির জোরেই ব্যবসা লাল হয়ে যাবে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

এবার আমি একটা জরুরি প্রশ্ন করলাম।

তোমার এই টাইম মেশিনের দর্শকের ভূমিকাটি কী? সে কি সশরীরে গিয়ে হাজির হবে অতীতে বা ভবিষ্যতে?

রন্ডি মাথা নাড়ল।

না, সশরীরে নয়। সে উপস্থিত থাকবে ঠিকই, কিন্তু অদৃশ্য, অশরীরী অবস্থায়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু সে নিজে সবই দেখবে। পৃথিবীর কোন অংশে যাওয়া হবে সেটা আগে থেকে ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডের বোতাম টিপে স্থির করা থাকবে। কত বছর অতীতে বা ভবিষ্যতে যাওয়া হবে তার জন্যেও আলাদা বোতামের ব্যবস্থা আছে। এই সব বোতাম টেপার পর দশ সেকেন্ড সময় লাগবে নির্দিষ্ট স্থান ও কালে পৌঁছোতে। একবার পৌঁছে গেলে পর বাকি কাজটা স্বপ্নে চলাফেরার মতো সহজ হয়ে যাবে। ধরো, তুমি কায়রোতে গিয়ে হাজির হয়েছ। তোমার যন্ত্রের সাহায্যে; সেখান থেকে যদি গিজার পিরামিডের কাছে যেতে চাও তো সেটা ইচ্ছা করলেই তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনটা যাত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী হবে, কিন্তু কালটা থাকবে অপরিবর্তিত।

তার মানে একবার অতীত বা ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে তারপর যেখানে খুশি যাওয়া চলতে পারে?

হ্যাঁ; কিন্তু ওই যে বললাম, দিন বা রাতের ঠিক কোন সময়ে পৌঁছোচ্ছ সেটার উপর আমার যন্ত্রের কোনও দখল নেই। আমি কালই খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ হাজার বছর আগের আলতামিরায় যাব বলে বোতাম টিপেছিলাম-ইচ্ছা ছিল প্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহার দেয়ালে কেমন করে ছবি আঁকে সেটা দেখব-কিন্তু গিয়ে পড়লাম। এমন এক অমাবস্যার মাঝরাত্তিরে যখন চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তখন স্থান পরিবর্তন করে চলে

গেলাম। সেই একই যুগের মোঙ্গোলিয়ায়, যেখানে তখন সকাল হয়েছে। কিন্তু তাতে তো আমার উদ্দেশ্য সফল হল না। তাই আমার অনুরোধ তুমি আমার যন্ত্রটা একবার দ্যাখো।

আমি বললাম, দেখব বলেই তো এসেছি। তবে ওটা শোধরাবার ব্যাপারে কতদূর কী করতে পারব সেটা এখনও বলতে পারছি না। আর তুমি যে তোমার ব্যবসায়ে আমাকে অংশীদার করে নেবার কথা বলছি তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ; কিন্তু সেটার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যা করব তাতে যদি আমার বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই আমি কৃতার্থ বোধ করব।

আমার কথায় রন্ডি কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইল, ভাবটা যেন-আমি কীরকম মানুষ যে রোজগারের এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছি।

রন্ডির বাসস্থানে যখন পৌঁছোলাম তখন প্রায় দুপুর বারোটা। আমার ঘর দেখিয়ে দিল রন্ডি নিজে। চমৎকার ব্যবস্থা, আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না।

এত বড় বাড়িতে সে একা থাকে কি না সেটা জিজ্ঞেস করাতে রন্ডি বলল যে তার আরেকটা আধুনিক বাড়ি আছে রোম শহরে, সেখানে তার স্ত্রী এবং মেয়ে থাকে। রন্ডি প্রতি দুমাসে একবার এক সপ্তাহের জন্য রোমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসে। তবে এই বাড়িটা বড় হওয়াতে কাজের সুবিধা এতে অনেক বেশি, বলল রন্ডি। আমার যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সব এখানেই আছে, আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এনরিকোও এখানে আমার সঙ্গেই থাকে। তা ছাড়া এখন তো প্রায়ই এখান সেখান থেকে বৈজ্ঞানিকেরা আসছেন আমার মেশিন দেখতে। এক দিন থেকে তাঁরা আবার যে যার জায়গায় ফিরে যান। আজ অবধি অন্তত ত্রিশ জন বৈজ্ঞানিক এসেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, আমি অসাধ্য সাধন করেছি!

কথা হল স্নানাহারের পর আমি যন্ত্রটা দেখব, তারপর রন্ডির অনুরোধ রক্ষা করতে পারব কি না সেটা স্থির করব। আমি যে টাইম মেশিনটা পরিকল্পনা করেছিলাম তাতে অবিশ্যি নির্দিষ্ট সময়ে অতীতে বা ভবিষ্যতে পৌঁছোনো যেত। আমার পরিকল্পনার সঙ্গে যদি রন্ডির যন্ত্রের কোনও মিল না থাকে তা হলে কতদূর সফল হব তা বলতে পারি না।

এটার লেখা বন্ধ করে থানে যাওয়া যাক। একটার সময় লাঞ্চ, সেটারন্ডি আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

নভেম্বর ১৮, বিকেল চারটা

আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই।

আজ সম্রাট অশোকের রাজ্যে গিয়ে তাঁর পশু চিকিৎসালয় দেখে এলাম রন্ডির মেশিনের সাহায্যে। দৃশ্য যে যোলো আনা স্পষ্ট তা নয়। একটা মশারির ভেতর থেকে বাইরেটা যেমন দেখা যায়, এ অনেকটা সেইরকম; কিন্তু তাও রোমাঞ্চ হয়, উত্তেজনায় দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। অশোক যে তার রাজ্যে আইন করে পশুহত্যা বন্ধ করে অসুস্থ পশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি করিয়েছিলেন সেটা ইতিহাসে পড়েছি, কিন্তু কোনওদিন সে হাসপাতাল চোখের সামনে দেখব, দেখব। একটা বিশাল ছাউনির তলায় একসঙ্গে শতাধিক গোরু ঘোড়া ছাগল কুকুরের চিকিৎসা চলেছে, এটা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? লোকজন কথা বলছে, সেটাও যেন কানে তুলো গোঁজা অবস্থায় শুনতে পাচ্ছি। সব শব্দই চাপা। হয় এটা যন্ত্রের দোষ, না হয় এর চেয়ে স্পষ্ট দৃশ্য আর শব্দ সম্ভব নয়। সেটা মেশিন পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারব। আজকে আমি শুধু যাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম; কাল মেশিনটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখব। এটা বলতে পারি যে আমার পরিকল্পিত মেশিনের সঙ্গে এটার যথেষ্ট মিল আছে, তাই ভরসা হয় যে আমি হয়তো রন্ডির অনুরোধ রক্ষা করতে পারব।

মেশিনটা বসানো হয়েছে একটা মাঝারি আকারের ঘরের প্রায় পুরোটা জুড়ে। নীচে একটা দু ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার মাঝখানে রয়েছে একটা দরজাওয়ালা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের

www.bengaliebook.com

কক্ষ বা চেম্বার। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতে হয় যিনি সফরে যাবেন তাঁকে। কতদূর অতীত বা ভবিষ্যতে যাওয়া হবে সেটা রন্ডিকে আগে থেকে বলে দিতে হয়, তারপর যাত্রী চেম্বারে ঢুকলে পর রন্ডি প্রয়োজনমতো বোতাম টিপে মেশিন চালু করে দেয়। আচ্ছাদনের ভিতর থেকেও যাত্রাটা কন্ট্রোল করা যায়, কিন্তু রন্ডি দেখলাম কাজটা যাত্রীর উপর না ছেড়ে নিজেই করতে পছন্দ করে। অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে ফিরে আসার ব্যাপারটা অবিশ্যি নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে আপনিই হয়ে যায়। যে সফরে যাচ্ছে, সে যদি দশ মিনিটের জন্য যায়, তা হলে তাকে পুরো দশ মিনিট কাটিয়ে ফিরতে হবে, যদি না তার আগে অন্য কোনও ব্যক্তি বোতাম টিপে তাকে ফিরিয়ে আনে।

প্লাস্টিকের চেম্বারে ঢুকে প্রয়োজনীয় বোতামগুলো টেপামাত্র যাত্রী একটা মৃদু বৈদ্যুতিক শক অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা নেমে আসে। তার কয়েক সেকেন্ড। পরেই সেই কালো পর্দা ভেদ করে নতুন দৃশ্য ফুটে বেরোয়। আমি দেখলাম একটা প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি, সময়টা দুপুর, রাস্তার দুপাশে সারি বাঁধা স্তম্ভের উপর মশাল জ্বালানোর ব্যবস্থা, রাস্তা দিয়ে পথচারী, গোরুর গাড়ি আর মাঝে মাঝে ঘোড়ায় টানা রথ চলেছে। পথের দুপাশে কারুকার্য করা কাঠের দোতলা তিনতলা বাড়ি—সব কিছু মিলিয়ে একটা চমৎকার সুশৃঙ্খলার ছবি। আমার অশোকের পশু চিকিৎসালয় সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল বেশি, তাই মনে মনে সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই দৃশ্য বদলে গিয়ে দেখি হাসপাতালে এসে গেছি।

সময় যে কোথা গিয়ে কেটে গেল জানি না। দশ মিনিটের শেষে রন্ডি বোতাম টেপাতে আরেকটা মৃদু বৈদ্যুতিক শকের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু অন্ধকার হবার পরমুহূর্তে দেখি মেশিনের ঘরে ফিরে এসেছি। রন্ডি আমার অভিজ্ঞতা কেমন হল জিজ্ঞেস করাতে মুক্তকণ্ঠে তার যন্ত্রের সুখ্যাতি করে আমার সাধ্যমতো তার অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করব সেটাও বলে দিলাম।

আজ রন্ডির সহকারী এনরিকের সঙ্গে আলাপ হল। বছর ত্রিশেক বয়স, সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার মধ্যে একটা ত্রিয়মাণ ভাব লক্ষ করলাম যেটার কোনও কারণ খুঁজে

পেলাম না। এত অল্প আলাপে মানুষ চেনা মুশকিল। তবে কথা বলে এটা বুঝলাম যে, ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। বলল, ওর ঠাকুরদা নাকি একজন ভারত-বিশেষজ্ঞ বা ইন্ডোলজিস্ট ছিলেন, সংস্কৃত জানতেন। শুনে কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পদবি কী? এনরিকে বলল, পেত্রি। তার মানে কি তুমি রিকার্ডে পেক্রির নাতি নাকি? এনরিকো হোসে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল যে আমি ঠিকই অনুমান করেছি। পেত্রির লেখা ভারতবর্ষের উপর বেশ কিছু বই আমি পড়েছি। স্বভাবতই এনরিকোকে বেশ কাছের লোক বলে মনে হল। সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলা যাবে।

কাল সকালে আমি মেশিনটা নিয়ে কাজে লাগিব। রন্ডি বলেছে। যদি আরও কাজের লোক দরকার হয় তো ব্যবস্থা করবে।

নভেম্বর ১৯

ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতিভূ হিসেবে আজ আমি আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছি। মাত্র তিনঘণ্টায় শুধু এনরিকোর সাহায্য নিয়ে আমি রন্ডির মেশিনে এমন একটি নতুন জিনিস যোগ করেছি, যার ফলে রন্ডির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

নেবুক্যাডনেজারের ব্যাবিলনে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পেট্রোলিয়াম বাতির ব্যবহারের ফলে রাত্রে শহরের চেহারা হত ঝলমলে। টাইম মেশিনে একটি বোতাম টিপে ব্যাবিলনে ঠিক রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছে সে দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। এ যে কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সেটা লিখে বোঝানো যায় না। অতীতের বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের আর কল্পনার সাহায্য নিতে হবে না। তারা এবার সব কিছু নিজের চোখে দেখে তারপর বই লিখবে। অবিশ্যি রক্তির চড়া রেট কোনও ঐতিহাসিক দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ নিয়ে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, এবং বলে বুঝেছি যে, ঐতিহাসিকদের কথা রন্ডি ভাবছে না; সে এখন চাইছে তার যন্ত্রের সাহায্যে যতটা সম্ভব পয়সা কমিয়ে নিতে। এখানে তার মূল্যবোধের সঙ্গে আমার আকাশ পাতাল তফাত। এই খোশমেজাজে ব্যক্তিটির এমন অর্থলিপ্সা হয় কী করে সেটাই ভাবি।

তবে এটা স্বীকার করতেই হয় যে সে একজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক। এই টাইম মেশিনের জন্য সে যে বিজ্ঞানের জগতে অমর হয়ে থাকবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ রন্ডি আমাকে এখানে আরও কয়েক দিন কাটিয়ে টাইম ট্র্যাভেলের আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরতে বলল। আমার তাতে আপত্তি নেই। টাইম ট্র্যাভেল জিনিসটা একটা নেশার মতো; আর দেখবার জিনিসেরও তো অন্ত নেই। কাল একবার ভবিষ্যতে পাড়ি দেবার ইচ্ছা আছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা ভবিষ্যৎকে নানানভাবে কল্পনা করেছেন। তাঁদের কল্পনার সঙ্গে আসল ব্যাপারটা মেলে কি না সেটা জানতে ইচ্ছা করে। মানুষ কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের দাস হয়ে দাঁড়াবে? আমার নিজের তো তাই বিশ্বাস।

নভেম্বর ১৯, রাত ১১টা

জার্মানির মুনিখ শহর থেকে আজ সন্ধ্যায় আমার বন্ধু উইলহেলম ক্রোল ফোন করেছিল। তাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে আমি মিলানে রন্ডির বাড়িতে আসছি। ক্রোল ঠাট্টা করে বলল, টাইম মেশিনের সঙ্গে জড়িত একজন বৈজ্ঞানিক তো খুন হয়ে গেল; দেখো, তোমাদের যেন আবার কিছু না হয়।

ক্রোলই বলল যে, ক্লাইবারের খুনের রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। মেশিন তৈরির ব্যাপারে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিল; আর একমাস বেঁচে থাকলেই তার মেশিন তৈরি হয়ে যেত।

আজ ডিনারের পর থেকেই শরীরটা কেন জানি একটু বেসামাল লাগছে। মাথাটা ভার, মাঝে মাঝে যেন ঘুরে উঠছে, দেহমানে একটা অবসন্ন ভাব। আমার সর্বরোগ-নিরাময়ক ওষুধ মিরাকিউরলের বড়ি সব সময় আমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেটা কোনওদিন আমাকে খেতে হয়নি। আজ একটা খেয়ে নেব। দেশের বাইরে অসুস্থ হয়ে পড়া কোনও কাজের কথা নয়।

নভেম্বর ২০, দুপুর ১টা

আজ অদ্ভুত ঘটনা। নকুড়বাবুর কথা কি শেষ পর্যন্ত ফলে যাবে নাকি? প্রথমেই বলি যে আমার ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ ভাল আছি। সেটা ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারছিলাম। অবসন্ন ভাবটা সম্পূর্ণ চলে গেছে। কিন্তু তাও সাবধানে থাকার জন্য ব্রেকফাস্টে শুধু কফি আর একটা টোস্ট ছাড়া আর কিছু খেলাম না। রন্ডি কারণ জিজ্ঞেস করাতে গতকাল শরীর খারাপের কথাটা তাকে বললাম, এবং আমার জীবনে প্রথম আমার নিজের তৈরি ওষুধ খেতে হয়েছে সেটাও বললাম। রন্ডি কথাটা মন দিয়ে শুনল। এনরিকোর দিকে চোখ পড়াতে দেখলাম তার কপালে ভাঁজ, দৃষ্টি অন্যমনস্ক।

রন্ডি প্রশ্ন করল, আজ কোন সেঞ্চুরিতে যেতে চাও?

আমি বললাম, আজ থেকে এক হাজার বছর ভবিষ্যতো।

কোন দেশে যাবে?

জাপান। আমার ধারণা ভবিষ্যতে জাপান টেকনলজিতে আর সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রগতির চেহারাটা তাদের দেশেই সবচেয়ে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়বে।

রন্ডি বলল সকালে তাকে একটু বেরোতে হবে; সে এগারোটা নাগাদ ফিরে তারপর মেশিনের ঘর খুলবে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার; যে ঘরে টাইম মেশিনটা থাকে, সে ঘরটা সব সময় চাবি দিয়ে বন্ধ করা থাকে এবং সে চাবি থাকে রন্ডির কাছে। অর্থাৎ সে নিজে দরজা না খুলে দিলে মেশিনের নাগাল পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কাল যতক্ষণ ধরে মেশিনে কাজ করেছি ততক্ষণ রন্ডি আমার পাশে ছিল। যতবারই আমি মেশিনে চড়ে সফর করেছি, ততবারই রন্ডি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বোতাম ঘুরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ রন্ডি যে

মেশিনটাকে বিশেষভাবে আগলে রাখছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাড়িতে বার্গলার অ্যালার্মের বন্দোবস্ত আছে। সদর দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। জানলা খোলা থাকলেও, প্রাসাদের ফটকে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। রন্ডি কি তা হলে মেশিনটা আমার কাছ থেকে আগলে রাখছে, না। এনরিকোর উপর তার সন্দেহ?

রন্ডি বেরিয়ে যাবার পর আমি তার লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকা নিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। আধা ঘণ্টা পর দরজায় একটা টোকা পড়াতে খুলে দেখি ফ্যাকাশে মুখে এনরিকো দাঁড়িয়ে।

তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার বলো তো?

বিপদ, ধরা গলায় বলল এনরিকো।

কার বিপদ?

তোমার। এবং আমি তোমায় সাবধান করেছি জানলে আমারও।

কী বিপদের কথা বলছি তুমি?

আমার বিশ্বাস কাল রাত্রে তোমার ফলের রসে বিষ মেশানো হয়েছিল।

আমি তো অবাক। বললাম, এ কথা কেন বলছ?

কারণ আর সব কিছুই আমরা সকলেই খেয়েছি, ফলের রসটা ছিল শুধু তোমার জন্য। একমাত্র তোমারই শরীর খারাপ হয়েছিল।

কিন্তু আমাকে বিষ খাইয়ে মারার প্রশ্ন উঠছে কেন?

আমার মনে হয়। টাইম মেশিনের ব্যাপারে ও কোনওরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করবে না, কারণ ওর ভয় ব্যবসাতে ওর ক্ষতি হতে পারে। ও চায় একাধিপত্য। একটা ঘটনার কথা বললেই ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে। যেদিন মেশিনটা তৈরি হয় সেদিন প্রোফেসর আনন্দের আতিশয্যে একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ওঁর মাতলামি আমি ওঁর অজান্তে দেখে ফেলেছিলাম। উনি ওঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইবার ও তোমার উদ্দেশে যে কী। কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করছিলেন, তা বলতে পারি না। ক্লাইবার অবিশ্যি তার আগেই খুন হয়েছে, কিন্তু তোমাকে উনি একচোট দেখে নেবেন সে কথা বারবার বলছিলেনু নেশার ঝোঁকে। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ওঁর ব্যাপারে ব্যাগড়া দেবে। উনি যে কীরকম লোক তুমি ধারণা করতে পারো না। ওঁকে মাতাল অবস্থায় না দেখলে ওঁর আসল রূপ জানা যায় না। উনি মেশিনটাকে কেমন ভাবে আগলে রেখেছেন সেটা তো তুমি দেখেছি। তোমাকে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, কারণ তোমাকে শেষ করে ফেলার মতলব করেছেন তাই। আর যে সব বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছেন তাঁদের কাউকে একবারের বেশি মেশিনটা ব্যবহার করতে দেননি। উনি। আমি ওঁর সহকমী, তিন বছর ওঁর পাশে থেকে কাজ করেছি, কিন্তু মেশিন তৈরি হয়ে যাবার পর উনি ওটা আমাকে ছুঁতে দেননি।

আমি তো অবাক। বললাম, তুমি টাইম মেশিনে সফর করে দেখনি এখনও?

সেটা করেছি। বলল এনরিকো, কিন্তু প্রোফেসরের অজান্তে। উনি গতমাসে একবার রোমে গিয়েছিলেন। সেই সময় লোহার তার দিয়ে চোরের মতো করে মেশিনের ঘরের তালা খুলি আমি। সেই ভাবেই এখনও রোজই রাত্রে গিয়ে আমি টাইম মেশিনের মজা উপভোগ করি। আমার নেশা ধরে গেছে; কিন্তু প্রোফেসর জানতে পারলে আমার কী দশা হবে জানি না।

তুমি কি তা হলে বলছি আমি এখান থেকে চলে যাই?

যদি থাক, তা হলে অন্তত এমন কোনও জিনিস খেয়ো না যেটা আমরা খাচ্ছি না। বিষ প্রয়োগ করে খুন্ন করাটা ওঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আমার আবার নকুড়বাবুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমি বললাম, আমার ওষুধের জন্য বিষ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

কিন্তু সেটা উনি বুঝতে পারলে তো অন্য রাস্তা নেবেন।

অন্য রাস্তাওকেনিতে দেবনা। আমি বুঝিয়েদেব যে আমার ওষুধ যথেষ্ট কাজ দিচ্ছে না। সেটুকু অভিনয় করার ক্ষমতা আমার আছে। যাই হোক, আমাকে সাবধান করে দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

এনরিকো চলে গেল। আমি খাটে বসে মাথায় হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। তারপর একটা কথা মনে হওয়াতে মুনিখে আমার বন্ধু ক্রোলকে আরেকটা টেলিফোন করলাম। এক মিনিটের মধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল।

কী ব্যাপার শঙ্কু? কোনও বিপদ হয়েছে নাকি?

আমি ক্রোলকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম। ক্রোল সব শুনোটুনে বলল, এনরিকো ছেলেটি একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ নয় তো?

আমি বললাম, না। আমার ধারণা এনরিকো যা বলছে তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু সে ব্যাপারটা আমি সামলাতে পারব মনে হয়। তোমাকে ফোন করছি এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য নয়। তোমার কাছে একটা ইনফরমেশন চাই।

কী?

প্রথমে বলো-ক্লাইবারের খুনি কি ধরা পড়েছে?

কেন জিজ্ঞেস করছ?

www.bengaliebook.com

কারণ আছে।

ধরা পড়েনি, তবে খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে বাড়ির বাগানের একটা অংশে মাটির নীচে। তাতে অবিশ্যি আঙুলের ছাপ নেই। কাজেই রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে।

খুনটা হয় কোন তারিখে?

তেইশে অক্টোবর। সময়টাও জানার দরকার আছে নাকি?

বললে ভাল হয়।

কী মতলব করছি বলো তো?

বলতে পারো এটা আমার অদম্য অনুসন্ধিৎসা।

তা হলে জেনে রাখো, ক্লাইবারের কাছে একটি সাংবাদিক আসে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। সে চলে যায় আটটার মধ্যে। তার কিছু পরেই ক্লাইবারের মৃতদেহ আবিষ্কার করে তার চাকর। পুলিশের ডাক্তার অনুযায়ীও খুনটা হয়েছিল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

অনেক ধন্যবাদ।

তুমি সাবধানে থেকে, এবং অযথা গোর্লমালের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। পারলে একবার মুনিখে ঘুরে যেয়ো।

যদি বেঁচে থাকি।

ফোন রাখার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে চিন্তা করলাম।

এখন বেজেছে পৌনে দশটা। রন্ডি এগারোটায় আসবে বলেছে। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে, এই ফাঁকে সেটা সেরে নিতে পারলে ভাল। কিন্তু এটা আমার একার কাজ নয়; এনরিকোর সাহায্য চাই। এনরিকো থাকে একতলায়। তার ঘর আমার চেনা।

আমি সোজা নীচে চলে গেলাম। এনরিকো তার ঘরেই ছিল। বললাম, তোমাকে একবার মেশিনের ঘরটা খুলতে হবে। একটু সফরে যাওয়ার দরকার পড়েছে। এক্ষুনি।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এনরিকোর তারের ম্যাজিক সত্যিই বিস্ময়কর। প্রায় চাবির মতোই সহজে খুলে গেল দরজা। এনরিকোকে আমার সঙ্গে রাখা দরকার, কারণ মেশিন চালু অবস্থায় বিপদ দেখলে সেই আবার আমাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনবে।

তুমি কি অতীতে যাবে, না ভবিষ্যতে? জিজ্ঞেস করল এনরিকো।

আমি বললাম, অতীতে। তেইশে অক্টোবর সন্ধ্যা সাতটা পচিশে। ভৌগোলিক অবস্থান ম্যাপ দেখে বলছি।

দেয়ালে টাঙানো পৃথিবীর এক বিশাল মানচিত্র দেখে কোলোনের ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড বলে দিলাম এনরিকোকে। তারপর প্লাস্টিকের ঘরে গিয়ে ঢুকতে এনরিকো বোতাম টিপে দিল।

কোলোনের একটা ব্যস্ত চৌমাথায় পৌঁছে ইচ্ছামতো গিয়ে হাজির হলাম। ক্লাইবারের বাড়ির সদর দরজার সামনে। এইখানেই অপেক্ষা করা ভাল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই সাংবাদিকের এসে যাওয়া উচিত। আকাশে এখনও ফিকে আলো রয়েছে। ক্লাইবারের বাড়ির সামনে একটি মাঝারি আকারের বাগান; বাড়িটি দোতলা এবং ছিমছাম। বাড়ির ভিতর থেকে একবার একটা মহিলাকণ্ঠ পেলাম—কারুর নাম ধরে একটা ডাক। ক্লাইবারের বয়স চল্লিশের কিছু উপরে; তার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান রেখে সে গত হয়েছে। এ খবর কাগজে পড়েছিলাম।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। একটা মার্সেডিজ ট্যাক্সি এসে সদর দরজার সামনে থামল। তার থেকে বেরোলেন একটি মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক, তাঁর এক গাল দাড়ি, পরনে গাঢ় নীল সুটের উপর ওভারকোট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, ডান হাতে ব্রিফকেস। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক সদর দরজার দিকে এগিয়ে কলিং বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল একটি চাকর।

প্রোফেসর বাড়িতে আছেন কি? আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন। তারপর পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমি টেলিফোনে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করেছিলাম।

আগন্তুক গলার স্বর খানিকটা বিকৃত করার চেষ্টা করলেও আমার চেনা চেনা লাগছিল। চাকরীটি কার্ড নিয়ে ভিতরে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে আগন্তুককে ভিতরে ডাকিল। তার পিছন পিছন আমিও ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই ল্যান্ডিং, তার একপাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ি, সিঁড়ির ধারে একটা হ্যাটস্ট্যান্ড। আগন্তুক ওভারকোটি খুলে চাকরকে দিয়ে হ্যাটটা স্ট্যান্ডে রেখে আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। তারপর চাকরের নির্দেশ অনুযায়ী পিছন দিকে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন, সেই সঙ্গে আমিও। নিজে অদৃশ্য হয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি বলে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করছি।

ঘরটা ক্লাইবারের স্টাডি বা কাজের ঘর। একটা বড় টেবিলের পিছনে ক্লাইবার একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে ছিল, আগন্তুক ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করল। লম্বা, সৌম্য চেহারা, মাথায় সোনালি চুল, ঠোঁটের উপর সরু সোনালি গোঁফ, চোখে সোনার চশমা। ক্লাইবার আগন্তুককে টেবিলের উলটোদিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধ দরজার সামনে। আমার চোখের সামনে যেন একটা ফিনফিনে পর্দা, তার মধ্যে দিয়ে দেখছি আগন্তুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ক্লাইবারকে অফার করলেন, ক্লাইবার প্রত্যাখ্যান করলে পর আগন্তুক নিজেই একটা

সিগারেট ঠোঁটে পুরে ক্লাইবারের সামনে থেকে রুপার লাইটারটা তুলে সেটা দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে প্যাকেটটা আবার পকেটে রেখে দিলেন। তারপর জার্মান ভাষায় প্রশ্নোত্তর, সব প্রশ্নই ক্লাইবারের টাইম মেশিন সংক্রান্ত। আমার নিজের শীত,গ্রীষ্ম বোধ নেই, কিন্তু এদের হাত কচলানো দেখে বুঝতে পারছি দুজনেরই বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। ঘরে একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, সে আগুন একটু উসকে দেবার জন্য ক্লাইবার উঠে। ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল, তার পিঠ তখন আগন্তুকের দিকে। এই সুযোগে আগন্তুক কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে ভোঁতা লোহার রড বার করে ক্লাইবারের হেঁট হওয়া মাথায় সজোরে আঘাত করলেন, এবং ক্লাইবারের নিস্পন্দ দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। তারপর আগন্তুক চোখের নিমেষে ম্যানটুলপিসের উপর থেকে তিনটি ছোট সাইজের মূর্তি তুলে নিয়ে ব্রিফকেসে ভরলেন।

ঠিক এই সময় ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ, আগন্তুকের সচকিত দৃষ্টি বন্ধ দরজার দিকে, মুখ ফ্যাকাশে। কিন্তু পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। এবার সুযোগ বুঝে আগন্তুক ঘর থেকে বেরোলেন, খুনের অস্ত্র আবার তাঁর আস্তিনের ভিতর লুকোনো।

আমিও বেরোলাম খুনির পিছন পিছন।

বাইরে ল্যান্ডিং-এ ওভারকেট হাতে চাকরের আবির্ভাব হল, আগন্তুক সেটা পরে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার, তারই মধ্যে খুনি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বাগানের এক কোণে লোহার ডাণ্ডাটা মাটিতে পুঁতে গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার সফর শেষ।

প্রোফেসরের গাড়ির শব্দ পেয়েছি। চাপা গলায় বলল এনরিকো।

দুজনে মেশিনের ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। লোহার তার দিয়ে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এনরিকো দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে গাড়ির দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আবার আমার ঘরে ফিরে এলাম।

আমি জানি ক্লাইবারের হত্যাকারী আর কেউ নয়-স্বয়ং রান্ডি। কিন্তু জেনে লাভ কী? সেই যে খুনি তার প্রমাণ আমি দেব কী করে? বিশেষ করে ঘটনার এতদিন পরে!

অনেক ভেবেও আমি এর কোনও কিনারা করতে পারলাম না।

যাই নীচে। রন্ডির চাকর কার্লো এসে খবর দিয়ে গেল যে তার মনিব মেশিনের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নভেম্বর ২২

আজ দেশে ফিরছি। আদৌ যে ফিরতে পারছি সেটা যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, সেটা সম্পূর্ণ ঘটনা বললে পরিষ্কার হবে। গত দু'দিন উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতার জন্য ডায়রি লেখার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি।

সেদিন রন্ডি ডেকে পাঠালে পর অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি নীচে গেলাম। রন্ডির দৃষ্টি প্রখর, তাই সে বুঝে ফেলল যে, আমার অসোয়াস্তি হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করাতে মিথ্যে কথার আশ্রয় নিতে হল। বললাম, আমার ওষুধে পুরো কাজ দেয়নি, তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে। আমার দেখার ভুল হতে পারে, কিন্তু মনে হল যেন রন্ডির চোখ চকচক করে উঠল। তারপর সে বলল, আমার একটা ইটালিয়ান ওষুধ খেয়ে দেখবো?

যাতে রন্ডি কিছু সন্দেহ না করে তাই বললাম, তা দেখতে পারি। আমি তো জানি যে ওষুধ যদি বড়ি হয় তা হলে সেটা জল দিয়ে খেতে হবে, আর জলে রন্ডি নির্ঘাত বিষ মিশিয়ে দেবে। কিন্তু যদিন মিরাকিউরাল খাচ্ছি তদিন বিষ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এও জানি যে, এনরিকো থাকার দরুন রন্ডি আমাকে সরাসরি খুন করতে

পারবে না, অল্প অল্প করে বিষ খাইয়েই মারবে। সে তা-ই করুক, এবং সেই সঙ্গে তার ফন্দি কাজ দিচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য আমাকেও অসুস্থতার ভান করে যেতে হবে।

অসুস্থতার অজুহাতে আজ টাইম মেশিনের ব্যাপারটা স্থগিত রাখা হল। রন্ডি ওষুধ এনে দিল। বড়িই বটে। রন্ডিরই আনা জল দিয়ে সে-বড়ি খেয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমি মিরাকিউরল খেয়ে নিলাম।

কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন চলবে? এদিকে জলজ্যান্তি প্রমাণ যখন পেয়েছি যে রডিই ক্লাইবারের আততায়ী, তখন তার একটা শাস্তির ব্যবস্থা না করে দেশেই বা ফিরি কী করে?

কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

লাঞ্চের সময় রন্ডি জিজ্ঞেস করল কেমন আছি। আমি বললাম, খানিকটা জোর পাচ্ছি। বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি অল্প করে খাব।

এনরিকোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। সে আমার পাশেই বসেছিল। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সে খাবার এক ফাঁকে আমার ডান হাতে একটা ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ গুজে দিল। খেয়েদেয়ে ঘরে এসে কাগজ খুলে দেখি তাতে লেখা, আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আড়াইটে নাগাদ তার কথামতো এনরিকো এসে হাজিরা। সে বলল, তখন হঠাৎ প্রোফেসর এসে পড়ায় তোমার কাছে জানতে পারিনি তোমার কোলোন সফরের ফলাফল।

আমি বললাম, তুমি যে এলে, যদি তোমার প্রোফেসর টের পান?

এনরিকো বলল, প্রোফেসরের অনেকদিনের অভ্যাস দুপুরে লাঞ্চের পর এক ঘণ্টা ঘুমোনো। ইটালির সিয়েস্তার ব্যাপারটা জান তো, এখানকার লোকেরা দুপুরে একটু না ঘুমিয়ে পারে না।

আমি এনরিকোকে আমার সফরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বললাম, প্রোফেসর রান্ডিই যে ক্লাইবারের আততায়ী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তিনি ছদ্মবেশ নিলেও তাঁর গলার স্বরে আমি তাঁকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁকে কী ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। প্রমাণ কোথায়?

এনরিকে বলল, প্রোফেসর গত মাসে রোমে যাচ্ছেন বলে যাননি, সে খবর আমি আমার এক রোমের বন্ধুর কাছে পেয়েছি। সুতরাং অনুমান করা যায় যে তিনি কোলোন গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটাকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরা যায়।

আমি মাথা নাড়লাম। রোম না গেলেই যে কোলোন যেতে হবে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। এবার এনরিকোকে একটা কথা না বলে পারলাম না।

আমার এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বন্ধু আমায় বলেছেন যে একুশে রাত নটায় আমার একটা বিপদ আসবে। সে বিপদ থেকে রক্ষা পাব কি না সেটা সে বলতে পারেনি। আমার জানতে ইচ্ছা করছে বিপদটা কী ভাবে আসবে।

এ ব্যাপারে তুমি টাইম মেশিনের সাহায্য নিতে চাইছ কি?

হ্যাঁ।

এনরিকো ঘড়ি দেখে বলল, তা হলে এক্ষুনি চলো। এখনও পয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে। আর দেরি করা চলে না।

আমরা দুজনে মেশিনের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এনরিকো বলল, দশ মিনিটের বেশি কিন্তু সময় দিতে পারব না তোমাকে।

আমি বললাম, তাতেই হবে।

প্লাস্টিকের খাঁচার মধ্যে দাঁড়ালাম। এবার আমি নিজেই বোতাম টিপলাম। দশ সেকেন্ড পরে দেখলাম যে আমি মিলানের বিখ্যাত ক্যাথিড্রালের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আমার ইচ্ছার জোরে রন্ডির প্রাসাদে আমার শোবার ঘরে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে 05

আমি দেখলাম আমি, অর্থাৎ ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু, অবসন্ন দেহে আমার ঘরে খাটের উপর শুয়ে আছি। দেখেই বুঝতে পারলাম, আমি বেশ গুরুতর ভাবে অসুস্থ। ঘরময় আমার জিনিসপত্র ছড়ানো, সেখানে কেউ যেন তাণ্ডব নৃত্য করেছে, যদিও কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

আমার চেহারা দেখে মায়া হলেও কিছু করার উপায় নেই। এ পাশ ও পাশ ঘুরে ছটফট করছি; একবার উঠে বসেই তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম, তারপর মাথা চাপড়লাম। গভীর আক্ষেপে যেন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঘরের দরজায় একটা টোকা পড়ল। খাটে শোয়া মানুষটা দরজার দিকে চাইল, আর পরীক্ষণেই ঘরে প্রবেশ করল রান্ডি। তার চোখের নির্মম চাহনি দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

আজ ডিনারে তোমার খাবার জলে একটু বেশি করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম, বলল রন্ডি, যাতে এবার আর মাথা তুলতে না পার। বুঝতেই পারছি, তুমি বেঁচে থেকে আরেকটা টাইম মেশিন তৈরি করে আমার ব্যবসায় ব্যাগড়া দাও, সেটা আমি চাই না। আমি চাই মিলানেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ হোক। কোনও কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে, কারণ তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারে এখনও জানে না। তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে-

দৃশ্য শেষ হয়ে দ্রুত অন্ধকার পর্দা নেমে এল।

www.bengaliebook.com

আমি আবার মেশিনের ঘরে।

সরি, প্রোফেসর, বলল এনরিকেগ। দশ মিনিট হয়ে গেছে; এবার পালাতে হয়।

বিপদ থেকে রক্ষা পাব কি না সেটা জানতে না পারলেও, বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছে এইমাত্র, সেটা এতই চাঞ্চল্যকর যে, আমার হাত কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

কী হল, প্রোফেসর শঙ্কু? জিজ্ঞেস করল এনরিকো।

আমি কোনওরকমে নিজেকে সংযত করে বললাম, একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। দুটো কাজ করা দরকার। একটা হল আমার বন্ধু ক্রোলকে মুনিখে ফোন করা।

আর দ্বিতীয়?

দ্বিতীয় কাজটা তোমাকেই করতে হবে। এতে একটু সাহসের প্রয়োজন হবে-যেটা তোমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কী কাজ?

আমি রন্ডির স্টাডিতে দেখেছি তার পাইপের বিরাট সংগ্রহ। কম করে কুড়ি-বাইশখানা পাইপ বাইরেই রাখা আছে। তার থেকে একটা নিয়ে পুলিশে দিতে হবে। আঙুলের ছাপের জন্য। পারবে?

অতি সহজ কাজ, বলল এনরিকো। পুলিশে আমার চেনা লোক আছে। এ বাড়িতে পুলিশের পাহারার বন্দোবস্ত সব আমাকেই করতে হয়েছিল।

ব্যস, তা হলে আর চিন্তা নেই।

আমরা দুজনে যে যার ঘরে চলে গেলাম। এনরিকো প্রতিশ্রুতি দিল যে, বিকেলের মধ্যে রন্ডির পাইপ তার হাতে চলে আসবে, এবং সে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে পুলিশ স্টেশনে।

আমি ঘরে চলে এসে ক্রোলকে ফোন করে যা বলার তা বলে দিলাম। তার সাহায্য বিশেষ ভাবে দরকার, তা না হলে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না। বলা বাহুল্য ক্রোলও কথা দিল যে তার দিক থেকে কোনও ত্রুটি হবে না।

এই সব ঘটনা ঘটেছে গত পরশু, অর্থাৎ কুড়ি তারিখে।

গতকাল একুশে সকালে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে একটা ব্যাপারের উল্লেখ করতেই হয়। রন্ডি আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছে। আমি অনুমান করছি যে সে আমাকে বিষ খাইয়েই চলেছে, কিন্তু আমিও সমানে আমার ওষুধ খেয়ে বিষের প্রতিক্রিয়াকে নাকচ করে দিয়ে শরীরটাকে দিব্যি মজবুত রেখে সুর্বলতার অভিনয় করে চলেছি।

এর ফলে রন্ডির মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে কি না সে চিন্তা আমার মনে এসেছিল, কিন্তু রান্ডিও চালাক বলে সেটা সে আমায় বুঝতে দেয়নি। গতকাল লাঞ্চের পর জানতে পারলাম তার শয়তানির দৌড়।

খাওয়া সেরে ঘরে এসে মিরাকিউরল খেতে গিয়ে দেখি বোতলটা যেখানে থাকার কথা– অর্থাৎ আমার হাতব্যাগে–সেখানে নেই।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বিষের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে আমার চরম বিপদ।

পাগলের মতো সারা ঘরময় ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছি, যদিও জানি যে, ওটা ব্যাগে ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারে না।

শেষটায় অসহায় বোধে এনরিকোর ঘরে ফোন করলাম, কিন্তু সেও ঘরে নেই। বেশ বুঝতে পারছি এবার শরীর সত্যি করেই অবসন্ন হয়ে আসছে। হয়তো বিষের মাত্রা আজ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে রান্ডি, যাতে অল্পদিনের মধ্যে সে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলতে পারে।

অবশেষে শয্যা নিতে বাধ্য হলাম। সমস্ত গায়ে ব্যথা করছে, হাত-পা অবশ, মাথা বিম বিষম।

এই অবস্থায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আবার এনরিকোকে ফোন করলাম। সে এখনও ঘরে ফেরেনি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, পাটিলছে। তাই আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দৃষ্টি যেন একটু ঘোলাটে। মৃত্যু কি এর মধ্যেই ঘনিয়ে এল? টেবিলের ওপর ট্র্যাভেলিং ক্লাকটার দিকে চাইলাম। ন'টা। তার মানে তো এখন

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছিলাম। টাইম মেশিনে। দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকে রন্ডি তার শাসনি শুরু করল। এ-সব কথা আমি কালই শুনেছি, আজি আরেকবার শুনতে হল।

কোনও কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে, কারণ তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারেরা এখনও জানে না। তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর লুইজি রন্ডি টাইম মেশিনের একচ্ছত্র সম্রাট। টাকার আমার অভাব নেই, কিন্তু টাকার নেশা বড়–

খট খট খট! –

রন্ডি চমকে উঠল। সে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

খট খট খট! –

রন্ডি নড়ছে না তার জায়গা থেকে। তার মুখ ফ্যাকাশে, দৃষ্টি বিস্ফারিত।

আমি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে গিয়ে রান্ডিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দরজাটা খুলে নিস্তেজ ভাবে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম।

ঘরে ঢুকে এল সশস্ত্র পুলিশ।

ক্রোল ও এনরিকো সত্যিই আমার বন্ধুর কাজ করেছে। সেদিন টাইম মেশিনের সাহায্যে যখন ক্লাইবারের ঘরে যাই, তখন দেখেছিলাম ক্লাইবারের লাইটার দিয়ে রন্ডি নিজের সিগারেট ধরাচ্ছে। হয়তো সে ভেবেছিল যে, লাইটারটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাড়াহুড়োতে সেটা তার মনে পড়েনি। আর আমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখেও খেয়াল করিনি। খেয়াল হওয়ামাত্র ক্রোলকে সেটা জানিয়ে দিয়ে বলি যে লাইটারে খুনির আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে, এবং সে ছাপ রন্ডির পাইপের ছাপের সঙ্গে মিলে যাবে।

শেষপর্যন্ত তাই হল।

আর আমার মিরাকিউরল পাওয়া গেল রন্ডির ঘরে, এবং সেটা খেয়ে শরীর সম্পূর্ণ সারিয়ে

নিতে লাগল চার ঘণ্টা।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯২